# ছায়ান্বিত '২৬ নামা

## একটি বিদায় অনুষ্ঠানের আদ্যোপান্ত

আরিয়ান মল্লিক ওয়াসি
ক্যাশিয়ার, ছায়ান্বিত ২৬

# সূচিপত্র

ভূমিকা ..... 3
কীভাবে শুরু ..... 6
প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র সভা ..... 8
উন্মুক্ত মিটিং সমুহ ..... 10
নামের জন্ম! ..... 12
ক্যাশিয়ার কে হবে? / “তোহফা এলাহী” ..... 14
এলাহি কাণ্ড ..... 15
কমিটি নির্ধারণ ..... 22
টাকা কারা তুলবে? ..... 23
শুরু হলো প্রকৃত আয়োজন ..... 24
ওয়েবসাইট তৈরি ..... 25
মার্চেন্ডাইজ শপ ..... 29
সিনেমাটোগ্রাফার নির্ধারণ ..... 32
কুপন বই তৈরি ..... 33
কিউআর কোড সিস্টেম ..... 34
রেফারেল সিস্টেম ..... 35
ব্যানার তৈরি ..... 36
রিল বানানো ..... 37

বাজেট নির্ধারন ..... 38
ব্যানার কই? ..... 39
থিম সং ..... 40
এমারজেন্সি কুপন বই! ..... 41
“জনাব তানভীর” ..... 43
ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন ও বুস্টিং ..... 49
টাকা নিয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা ..... 52
স্পন্সর লিস্ট তৈরি ও স্পন্সর লেটার পাঠানো ..... 55
স্কয়ার থেকে কল ও সেদিনের মুহুর্ত ..... 56
সবাইকে কল ও এসএমএস দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা ..... 60
খাবারের সন্ধানে ..... 62
বিভিন্ন ধাপে কমিটি থেকে ছাটাই ..... 64

# ভূমিকা

প্রথমে আসি- বিদায় অনুষ্ঠান কী? আর এটি কেন করা হয়?

বিদায় অনুষ্ঠান বা বিদায় সংবর্ধনা এখন বাংলাদেশের স্কুল ও কলেজ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। এটি কেবল একটি রীতি নয়, বরং এটি কোনো একটি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর এক আবেগঘন মুহূর্ত যেখানে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এক সূক্ষ্ম সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। শিক্ষা জীবনের একটি অধ্যায় যখন শেষ হয়, তখন সেই অধ্যায়ের মানুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো, স্মৃতিগুলোকে গুছিয়ে রাখা, এবং নতুন পথে যাত্রার আগে শেষবারের মতো সবার মুখ দেখা- এই অনুষ্ঠান যেন সেই সব কিছুরই প্রতীক।

বিদায় অনুষ্ঠান মানেই কেবল আনন্দ নয়; এর ভেতরে থাকে এক মিশ্র অনুভূতি। একদিকে সাফল্য এবং গর্ব, কারণ আমরা একটি দীর্ঘ যাত্রা শেষ করেছি। অন্যদিকে থাকে হালকা বিষণ্ণতা কারণ যাদের সঙ্গে প্রতিদিনের হাসি, ক্লাস, পরিশ্রম, তর্ক-বিতর্ক, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, সেই মানুষগুলো থেকে আজ আমরা দূরে যেতে চলেছি। আবার সবার মধ্যেই রয়েছে আগামী পরীক্ষা নিয়ে সংশয়। এই মুহূর্তগুলোই আমাদের জীবনের এক অমূল্য অধ্যায় হয়ে থেকে যায়।

একটি বিদায় অনুষ্ঠান শুধু শিক্ষার্থীদের আবেগের কেন্দ্র নয়, এটি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে মূল্যবোধ হস্তান্তরেরও একটি অনন্য সুযোগ। সিনিয়রদের বিদায়ের মাধ্যমে জুনিয়ররা অনুপ্রেরণা পায়, শেখে দায়িত্ব, ঐক্য ও আত্মত্যাগের মানে। অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের এক সেতুবন্ধন, যেখানে

ভাগ করে নেওয়া হয় অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নের গল্প। এটি এমন একটি মুহূর্ত যা আমাদের শেখায়- সময় থেমে থাকে না, কিন্তু সম্পর্ক, শ্রদ্ধা ও স্মৃতি সময়ের সীমা ছাড়িয়ে বেঁচে থাকে চিরকাল।

কিন্তু একটি বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা মানে শুধু একদিনের উৎসব নয়। এটি এক বিশাল প্রক্রিয়া যার মধ্যে থাকে শত শত ছোট-বড় সিদ্ধান্ত, অসংখ্য মিটিং, রাতজাগা পরিকল্পনা, হাসির ফাঁকে ক্লান্তি, বন্ধুত্ব, দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা। একেকজনের দায়িত্ব, কারো স্বপ্ন, আর কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে এটি হয়ে ওঠে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

“ছায়ান্বিত ’২৬ নামা” সেই অভিজ্ঞতারই দলিল। এটি কেবল একটি অনুষ্ঠানের গল্প নয়; এটি সেই সময়ের প্রতিটি অনুভূতির সাক্ষী। এখানে আছে আমাদের সংগ্রাম, একাগ্রতা, ভুল, শেখা, ও সফলতার গল্প। আমরা কীভাবে একটি স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি, কীভাবে অনিশ্চয়তার ভেতর থেকেও নিজেদের বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রেখেছি, আর কীভাবে শেষ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান আমাদের হৃদয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে উঠেছে, সবই এই বইয়ের পাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে।

তাই "ছায়ান্বিত '২৬ নামা" কেবল একটি অনুষ্ঠানপঞ্জি নয়; এটি আমাদের ব্যয়িত সময়ের প্রতিফলন, আমাদের কয়েকজনের বন্ধুত্বের অমর স্মৃতি, এবং আমাদের কলেজ জীবনের এক চিরসবুজ দলিল। এই গ্রন্থের প্রতিটি পাতায় ছড়িয়ে আছে আমাদের হাসি, আমাদের কান্না, এবং সেই সব রাত যখন আমরা স্বপ্ন দেখেছি অসম্ভবের। এটি আমাদের পরিচয়, আমাদের ইতিহাস, এবং আগামীর জন্য নির্দেশনা ও উপদেশ। যখন আমরা বছরের পর বছর পর এই বইটি খুলব, তখন

স্মৃতির গভীরে ডুব দিয়ে আমরা আবার সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলোকে জীবন্ত করে তুলব। এটি শুধু একটি বই নয়, এটি আমাদের সৃষ্টি, আমাদের গর্ব, এবং আমাদের চিরকালের ভালোবাসার এক স্থায়ী সাক্ষ্য।

# কীভাবে শুরু

আমাদের এই বিদায় অনুষ্ঠানের সূচনালগ্নের পুরো কর্তৃত্বই আমি দিতে চাই একমাত্র একজনকে আর সেই মানুষটি হল ফয়সাল আরেফিন সেজান। সেজানের উদ্যোগের ফলেই সবকিছু শুরু হয়েছে এবং আমি মনে করি সে না থাকলে আমরা এতদূর আসা আর হত না। সেজানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সবাইকে একত্রিত করার ফলেই আমরা এত সুন্দর একটি প্রোগ্রাম করতে পেরেছি। সেইজন্য প্রথমেই তাকে জানাই প্রাণঢালা ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, ও অভিনন্দন। আমি মনে করি সেজান না থাকলে আমাদের এত বড় একটা প্রোগ্র্যাম এত সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো।

প্রথমদিকে বিষয়টি নিয়ে কারই তেমন মাথাব্যথা ছিলো না। সর্বপ্রথম সেজানের মধ্যেই এটি দেখেছি আমি। আমরা কেওই তখন পর্যন্ত ভাবতেও পারিনি যে আমাদের বিদায় অনুষ্ঠান করারও প্রয়োজন আছে। যখন করো মাথাই এই চিন্তা আসেনাই তখন একমাত্র সেজান ছিলো আমাদের পাশে। সেই সর্বপ্রথম সবাইকে একত্র করেছে, সবার মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে যে আমাদেরও করতে হবে! আমাদেরও অন্যদের দেখিয়ে দিতে হবে যে আমরাও পারি!

আজ যখন পেছনে ফিরে তাকাই, দেখি সেই ছোট্ট উদ্যোগটাই কীভাবে এক বিশাল স্মৃতিতে রূপ নিয়েছে। সেজানের সেই প্রথম পদক্ষেপ, সেই এক মিটিং ডাকা, সেই এক আলোচনাই আসলে ছিল "ছায়ান্বিত ২৬"-এর প্রথম শ্বাস। হয়তো তখন কেউ জানত না, এই এক আয়োজন আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ও সুন্দর অভিজ্ঞতাগুলোর একটি হয়ে থাকবে। তার ভেতরে ছিল এক ধরনের নিঃস্বার্থ উদ্যম, যা মানুষকে অনায়াসে ছুঁয়ে

যেত। আমরা বুঝেছিলাম, একজন সত্যিকারের নেতা কোনো পদবি দিয়ে তৈরি হয় না—হয়ে ওঠে দায়বদ্ধতা আর আবেগ দিয়ে।

# প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্র সভা

একদম শুরুর দিকে সেজান কয়েকজনকে নিয়ে দুইটি ক্ষুদ্র মিটিং ডাকে। উক্ত মিটিংগুলোতে তেমন কিছু নির্ধারণ না হলেও উদ্যোগ নেওয়াটাই প্রধান বলে আমি মনে করি। এর মাধ্যমে আমি আর কিছু না হোক একটা জিনিস জানতে পেরেছি যে পাবনার রিভার ভিউ রিসোর্টে চাইলেই বসা যায় কোনও কথা ছাড়া!

উক্ত মিটিংগুলোতে সর্বপ্রথমে ব্যাচের নাম নির্ধারণকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। যদিও এতে কোনও লাভ হয়নাই কারণ নাম তখনও কারও মাথায় ছিলনা এবং প্রচুর চেষ্টার পরেও অমরা কোনো নাম নির্ধারণ করতে সক্ষম হতে পারিনি। তবে প্রথমদিকে এই মিটিংগুলোতে আমরা প্রোগ্রাম সম্পর্কে অনেককিছু খসড়া করতে পেরেছি, যেমন প্রোগ্রাম এ কি কি উপাদান যোগ করা যায়, কোন ব্যান্ড আনা যায়, কয়টি ব্যান্ড আনা যায়, কোন কোন খাত থেকে স্পনসর এর জন্যে আবেদন করা যায়, কমিটি তে কাদের কাদের রাখা যায়, প্রথমদিকে কার কি দায়িত্ব, কে কোন কাজে ভালো, আমাদের কি কি কাজ করতে হবে, এগুলোই আরকি।

তবে এসব আলোচনার চেয়ে সেইসব মিটিংএ মজাই বেশি হয়েছে। যাকে আমি খারাপ কিছু বলে মনে করিনা। যেহেতু এই মিটিংয়ের সময় আমাদের হাতে এখনও ৫ মাসের মত সময় ছিলো তাই শুরুতেই কেউ এত সিরিয়াস ছিলোনা এই বিষয়ে। তবুও ওই কয়েক ঘণ্টার ছোট ছোট আলোচনা থেকেই হয়তো পুরো প্রোগ্রামের কাঠামোর বীজ বোনা হয়েছিল- যেন একটা বিশাল গাছের শিকড় তখনই অজান্তে গজাতে শুরু করেছিল। সেই সময় কেউই জানত না “ছায়ান্বিত ২৬” নামে কিছু তৈরি হবে, বা সেটা যে এমন একটা উচ্চপর্যায়ে পৌঁছাবে যেটা আমরা কেউই তখনো কল্পনাও করিনি। ধীরে ধীরে আমার

চোখের সামনে আমি এমন একটি অসাধারণ প্রোগ্রামের দায়িত্ব সফলভাবে পালন করতে পেরেছি এবং পাবনাবাসীকে এত ভালো একটা প্রোগ্রাম উপহার দিতে পেরেছি বলে সত্যিই নিজেকে ধন্য বলে মনে করি।

# উন্মুক্ত মিটিং সমুহ

আমাদের ক্ষুদ্র মিটিং এর পরে কয়েক মাস বিদায় অনুষ্ঠানের চিন্তাভাবনা সবার মধ্যে মোটামোটি দমে যায়। কিন্তু হঠাৎ করেই একটা গ্রুপ খোলা হয় বিদায় অনুষ্ঠানের উদ্যেশ্যে সকলকে নিয়ে। ধীরে ধীরে সেই গ্রুপের সদস্য সংখ্যা বেড়েই চলে আর বেড়েই চলে এবং একসময় সেটি ২৫০ এ গিয়ে ঠেকে যা হলো মেসেঞ্জার গ্রুপের সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা। উক্ত গ্রুপেই আমরা সাধারণত বিদায় অনুষ্ঠান সম্পর্কে সকল আলোচনা করতাম প্রথমদিকে।

উক্ত গ্রুপের সদস্যদের তথা বুলবাল কলেজের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত শোনার জন্য কয়েকবার আমরা উন্মুক্ত মিটিংয়ের আয়োজন করেছি। যেইসব মিটিংয়ে আমরা বেশ ভালো পরিমাণ উপস্থিতি, অংশগ্রহণ, ও ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ দেখতে পেয়েছিলাম। দেখে ভালোই লাগছিল যে সবাই চাই একটি সুন্দর বিদায় সংবর্ধনা হোক। উক্ত মিটিংগুলোতে আমরা সবার থেকে মতামত নিতাম যে ব্যাচের নাম কি রাখা যায়, কোন ব্যান্ড আনা যায়, প্রোগ্র্যাম এ কি কি উপাদান রাখা যায়।

তবে খুব শীঘ্রই আমরা বুঝে ফেলি যে আমাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে চলবেনা। সাধারণ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বুদ্ধি আমি মনে করি সকল বিষয়ে সমান না। কেউ কিছুতে ভালো তো কেউ কিছু সম্পর্কে কিছুই জানেনা। সকলের সংমিশ্রণেই তৈরি আমাদের এই ব্যাচ। যার ফলে কোনো বিষয়ে মতামত চাইলে একেকজনের একেক মতামত পাওয়া যায়। তার মধ্যে কে সঠিক কে ভুল এইটা নির্ধারণ করা একটা কষ্ট, এবং এর পাশাপাশি সকলকে একসাথে খুশি করাও আরেকটা কষ্ট। একজনকে খুশি করতে

গেলে আরেকজন অখুশি হয়ে যায়। যার ফলে আমরা সিদ্ধান্ত নেই বেশি উন্মুক্ত মিটিং না করে কমিটি নির্ধারণ করে শুধুমাত্র কমিটি মিটিং করাই শ্রেয়।

# নামের জন্ম!

প্রথমে সেই ক্ষুদ্র মিটিং তারপর কলেজে উন্মুক্ত মিটিং প্রত্যেক ধাপেই আমরা নাম নির্ধারণের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। সবার মাথায় এ বিভিন্ন নাম এসেছিল তবে কোনটিই মানানসই হচ্ছিল না। কেননা নামের প্রথম শর্ত হলো নামটি সালের সাথে মিল রেখে দিতে হবে যেমন ২৬ বা ছাব্বিশ এর জন্য আমাদের শব্দটি নির্ধারণ করতে হবে যেন সেটি ছ বা স দিয়ে শুরু হয়। একদম প্রথমে আমরা ছায়াঙ্ক '২৬ দিতে চেয়েছিলাম। প্রথমদিকে ভাবা কিছু নামের মধ্যে রয়েছে *ছটফট '২৬, ছন্দছায়া '২৬, ছন্দপথ '২৬, ছন্দপথিক '২৬, ছন্দময় '২৬, ছন্দরেখা '২৬, ছয়রঙা '২৬, ছান্দস '২৬, ছান্দসিক '২৬ , ছায়াঙ্ক '২৬, ছায়াত্মজ '২৬, ছায়াত্মজ '২৬, ছায়াদল '২৬, ছায়াদীপ '২৬, ছায়ানট '২৬, ছায়াপথিক '২৬, ছায়াবৃত্ত '২৬, ছায়াশক্তি '২৬, ছিদ্রান্বেষী '২৬, ছিন্নদ্বৈধ '২৬, ছিন্নস্তর '২৬, ছোপরঙা '২৬, সংকল্প '২৬, সংগ্রামী '২৬, সজ্জিত '২৬, সন্ধিপথিক '২৬, সপ্নছায়া '২৬, সাম্যছায়া '২৬, সুপ্ত প্রতিভা '২৬, সুমিষ্ট '২৬, সুরপ্রহর '২৬, সূর্যাস্ত '২৬, সূর্যাস্ত '২৬, সৃজন '২৬, সৃতিচারণ '২৬, সৃতিবিদ্যা '২৬, সৃতির '২৬, স্নিগ্ধ '২৬, স্বপ্নসিঁড়ি '২৬, স্বপ্নীল '২৬, স্মৃতির '২৬।* এগুলো যখন আমাদের মাথায় আসলো তখন আমরা ছায়াবৃত্তের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমাদের এই এক নামের জন্য বহুত ঝামেলা পার করতে হয়েছিল কেননা আমরা চেয়েছিলাম ছায়া বা ছন্দ বাদ রেখে একটি নাম বাছতে কারণ সেগুলি ইতিমধ্যেই পাবনা জিলা স্কুল ও পাবনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৬ ব্যাচ তাদের নেম ব্যবহার করে ফেলেছিল। কিন্ত ছ দিয়ে নামের সমস্যা এইটাই যে ছয় বা চন্দ বাদে নাম খুঁজা প্রায় অসম্ভব। অনেক চিন্তার পরেও আমরা কোনো মনমতো নাম পাচ্ছিলাম না। একদিন হঠাৎ সেজান আমাদেরকে নতুন একটা নাম দেখায়-

ছায়ান্বিত ’২৬। নামটি সবারই কমবেশি পছন্দ হওয়াতে হঠাৎ করেই নামটি আমাদের নতুন পরিচয় হয়ে উঠলো। পরে জানতে পারলাম নামটি সেজান চ্যাটজিপিটি থেকে পেয়েছিল!

## ক্যাশিয়ার কে হবে? / “তোহফা এলাহী”

# এলাহি কাণ্ড

আমাদের প্রোগ্রামের আয়োজন তখন পূর্ণমাত্রায় চলছে। নাম ঠিক হয়েছে, তারিখ ঠিক হয়েছে, এমনকি আনুমানিক বাজেটও আমরা সাজিয়ে ফেলেছি। পরিকল্পনাটা ছিল বড় কিছু করার—একটা এমন অনুষ্ঠান, যেটা শুধু আমাদের ব্যাচের শেষ স্মৃতি নয়, বরং ভবিষ্যতে ফিরে তাকালে গর্বে বুক ভরে উঠবে। এই স্বপ্নের ভিতেই ছিল এক অদ্ভুত তাড়না, একটা দায়িত্ববোধ—যে কোনোভাবে যেন আমরা অর্ধেক মানের কিছু না করি।

কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে, প্রতিটি বড় স্বপ্নের গায়ে দাম লেখা থাকে। বাজেটের হিসাব কষতে কষতে আমরা দ্রুতই বুঝে ফেললাম, অনুষ্ঠানটা যতটা বড় করে ভাবছি, ততটা অর্থ আমাদের হাতে নেই। সবার রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়েও সেটা পুরোপুরি মেটানো সম্ভব নয় একটা ঘাটতি থাকবেই, যেটা পূরণ করতে হবে স্পনসরদের মাধ্যমে ঠিক পুর্রবের ব্যাচদের মতোই। এই পর্যন্ত সব কিছুই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যা শুরু হলো যখন এই ফি নিয়েই দলের ভেতরে মতবিরোধ দেখা দিল।

কমিটির এক সদস্য, নাম তার তোহফা যে শুরু থেকেই নিজের মতামত একটু জোর গলায় বলে, হঠাৎ করেই দাবি তুললো, রেজিস্ট্রেশন ফি কমাতে হবে! তার যুক্তি খুবই সোজা: *“সবাই চায় কম টাকা দিতে। বেশি ফি দিলে অনেকেই অংশ নেবে না।”* কথাটা শুনলে যুক্তিসঙ্গতই লাগে, কিন্তু যারা একটু গভীরে তাকায়, তারা বোঝে—এই যুক্তি যতটা সহজ, বাস্তবটা ততটাই জটিল।

আমরা জানতাম, ফি কমালে নতুন কেউ যোগ দেবে না। কারণ টাকার অঙ্কটা এমনিতেই এত বড় নয় যে কেউ শুধু সেই কারণে বাদ পড়বে। বরং ফি কমানো মানে হবে প্রোগ্রামের মান নামিয়ে আনা, অনেক কিছুর কাটছাঁট করা—স্টেজ, সাউন্ড, লাইট, এমনকি কিছু অংশগ্রহণমূলক আয়োজনও বাদ দিতে হবে। অথচ আমাদের লক্ষ্যই ছিল উল্টোটা: একটা *proper*, *memorable*, আর *well-organized* অনুষ্ঠান।

এই বিষয়টা নিয়ে যখন আমরা কথা বলার চেষ্টা করলাম যে আমাদের নির্ধারিত ফি ন্যায্য, সবাই দিতে পারবে এই টাকাটা, সে হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "আমি একা নই, আসো দেখা করো।"
আমরা জানতাম এর মানে সে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে আসবে, সংখ্যা বাড়িয়ে নিজের মতামতকে ওজন দিতে চাইবে। এর আগেও এমন একবার হয়েছে। আগেরবার আমরা বিষয়টা শান্তভাবে মিটিয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু এবার বিষয়টা ছিল গুরুতর—কারণ এবার বাজেটের মূল কাঠামোই প্রশ্নবিদ্ধ।

আমরা তখন স্পষ্টভাবে হিসাব কষে দেখালাম:

"এই প্রোগ্রামে আমাদের ৪০০–৫০০ জন অংশগ্রহণ করবে। প্রতি জনে মাত্র ১০০ টাকা কমালেই বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৫০,০০০ টাকার মতো। আর ২০০ টাকা কমালে ঘাটতি প্রায় এক লাখ। এই অঙ্কটা শুধু কাগজে লেখা সংখ্যা নয়- এটাই আমাদের সাউন্ড সিস্টেম, লাইটিং, স্টেজ, এমনকি প্রয়োজনীয় সজ্জার বাজেট।"

তবুও সে বলল, *"ছোট করে করো, তাতে সমস্যা কী?"*
আমি ভাবলাম—ছোট করে করা মানে শুধু একটা শব্দের পরিবর্তন নয়, এটা

মানে হলো স্বপ্নের আকার ছোট করা, সেই গর্বের অনুভূতিটা ম্লান করে দেওয়া। কেন আমরা ছোট করব? কিসের অভাবে? যদি প্রকৃত কারণ হতো অর্থনৈতিক অসুবিধা, তাহলে বুঝতাম। কিন্তু এখানে তা নয়—এটা কেবলই একটা "জনপ্রিয়" অবস্থান নেওয়া, যেন সবাই ভাবে সে তাদের জন্য লড়ছে।

আমাদের অবস্থান ছিল অন্যরকম। আমরা জানতাম, প্রোগ্রাম মানে শুধু গান বা আলো নয়—এটা আমাদের সম্মিলিত প্রতিচ্ছবি। আমরা যদি নিজেরাই হাত গুটিয়ে নিই, তাহলে ভবিষ্যতের ব্যাচেরা আমাদের দৃষ্টান্ত হিসেবে দেখবে না, বরং বলবে—"ওরা পারল না।"

তাই আমি স্পষ্ট করে বললাম,

"আমরা রেজিস্ট্রেশন ফি কমাতে চাই না। কারণ এতে নতুন কেউ যোগ দেবে না, বরং ঝুঁকি বাড়বে। স্পনসরদের ওপর নির্ভর করতে হবে আরও বেশি, অথচ স্পনসর আসে শেষ সময়ে। ওদের সঙ্গে আগেভাগে কাজ শুরু না করলে শেষমেশ পেমেন্ট ডিউ পড়ে যাবে। তাতে প্রোগ্রামের সুনাম যাবে, আমাদেরও রেপুটেশন ক্ষুণ্ণ হবে।"

আমি জানতাম, অনেকেই সংখ্যা বোঝে না, কিন্তু তারা মর্যাদা বোঝে। তাই বললাম,

"এই টাকা কমানো মানে কয়েকশো টাকা বাঁচানো নয়—এটা মানে আমরা নিজেরাই নিজেদের প্রোগ্রামের মর্যাদা নষ্ট করছি।"

দলের মধ্যে তখন দুইটা স্পষ্ট শিবির গড়ে উঠেছে, কিছু সংখ্যক লোকে বলে, *"কমাও, সবাই রাজি হবে,"* আরেকদল বলে, *"না, মান ধরে রাখো।"* আমি সেই দ্বিতীয় দলে, কিন্তু আমার অবস্থানটা ছিল কেবল আবেগের না—পুরো হিসাব, ঝুঁকি, বাস্তবতা দেখে নেওয়া সিদ্ধান্ত।

আমরা তখন ভাবলাম, এই বিতর্কের শেষ টানার একটাই উপায় আছে—সব কিছু খোলাখুলি জানানো।
একটা সাধারণ সভা ডাকা হবে, সেখানে আমরা পুরো বাজেট ব্রেকডাউন দেখাবো:

- কত খরচ কোথায় হচ্ছে
- ফি কমলে কোন অংশ কাটা যাবে
- স্পনসর না এলে কী ঝুঁকি
- আর, কীভাবে এই সব কিছু সরাসরি প্রোগ্রামের মানে প্রভাব ফেলবে

এরপর সবাইকে বলা হবে, ভোট দাও।
**অপশন A:** বর্তমান ফি, সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম, মান বজায় থাকবে।
**অপশন B:** কম ফি, কিন্তু অর্ধেক মানের অনুষ্ঠান, এবং অতিরিক্ত স্পনসর ঝুঁকি।

আমি জানতাম, সংখ্যার যুদ্ধকে পরাজিত করার একমাত্র উপায় হলো সংখ্যার ভেতরেই যুক্তি ঢোকানো।

যখন এই চিন্তাটা মাথায় এলো, আমার মনে পড়ল—আমরা অনেক সময় বিশ্বাস করি সবাই বুদ্ধিমান, সবাই বোঝে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সবাই যুক্তিতে চলে না;

কেউ চলে সুবিধায়, কেউ চলে জনপ্রিয়তার ভয়ে। তাই আমি চেষ্টা করলাম কথাটাকে কেবল হিসাবের না, আবেগের দিক থেকেও বোঝানোর চেষ্টা করতে।

আমি পরবর্তী সভার জন্য একটা স্ক্রিপ্ট লিখলাম যার সারাংশ নিম্নরূপ:

"আমাদের এই প্রোগ্রাম একবারই হবে। এটা এমন একটা স্মৃতি, যেটা সারাজীবন থাকবে। আজ যদি আমরা টাকা বাঁচানোর করার নামে মান নামিয়ে দিই, কাল সেটা হাসির কারণ হবে। কিন্তু যদি একটু কষ্ট করে ভালো কিছু করি, সেটা গর্বের কারণ হবে। এক দুইশত টাকা বাচিয়ে কোনো লাভ নেই, কিন্তু একবার খারাপ অনুষ্ঠান করলে সেটা সারাজীবন মনে থাকবে।"

পরবর্তীতে সভা ডাকা হলো, এবং সভায় রুমভর্তী দর্শক উপস্থিত ছিলো। বলা বাহুল্য সভার আগেরদিন রাতেই আমরা তোফাকে বুঝিয়ে রেখেছিলাম ১২০০ টাকার বিষয়টা এবং সে অনেকাংশে রাজিও হয়ে গিয়েছিল। এবং পরেরদিন সকালে কলেজেও সভা শুরু হওয়ার আগেই যারা মূল সমস্যা সৃষ্টিকারী ছিল তাদেরকে আমরা বুঝিয়ে ফেলেছিলাম যে ১২০০ই সঠিক। তবুও যেহেতু সভা ডাকা হয়েছে তাই আমরা সভাটি বজায় রাখলাম।

সভার সময় আমরা প্রথমে পেছনে গিয়ে বসলাম। আমরা ভেবেছিলাম হয়তো তোহফা তার বক্তব্য দিয়ে আগে শুরু করবে কেননা আমরা শুরু থেকেই একটি জিনিস নির্ধারিত করে রেখেছি সে এখন হঠাৎ তার বিরোধিতা করছে তাহলে তো তারই তো উচিত তার পক্ষের যুক্তিটা আগে দেওয়া। কিন্ত না, সে প্রথমেই সেজানকে আগে ডাকলো এবং আমাদের পক্ষে যুক্তি দিতে বললো। এতে বোঝাই যাচ্ছিল আসলে সে একটি ফাঁকা আওয়াজ।

অত:পর আমরা সুন্দরমত সবাইকে আমাদের পক্ষের যুক্তি দেখানোর পর তাঁকে যুক্তি দেখাতে বলায় সে বলে যে তার আর কি দরকার যুক্তি দেখানোর আমরা তো বলেই দিয়েছি তাহলে ১২০০ই থাক। এতে সবাই ক্ষেপে যায় কারণ তার যদি কিছু বলারই না থাকে তাহলে আমাদের এত কষ্ট করে বাসা থেকে কলেজে সভায় নিয়ে আসলে কেন? এভাবে সবাই বিশেষ করে হাফসা তোহফার সাথে রগড়গি শুরু করে এবং তোহফা হাতজোড় করে হাফসার কাছে মাফ চায় যা আমার জন্যে অত্যন্ত স্বরনীয়

পরবর্তীতে মিটিং শেষে কলেজে বহিরাগতদের প্রবেশ নিয়ে দুই পক্ষের একটি গুরুতর ঝামেলা হয় তবে সেটি পরে মীমাংসা হয়ে যায় তাই এ নিয়ে আর বেশিকিছু লিখলাম না।

তাই আজ, এই অধ্যায়ের শেষে আমি শুধু একটাই কথা লিখে রাখব- *স্বপ্নের মূল্য কখনও টাকায় মাপা যায় না, কিন্তু দায়িত্ববোধের অভাবই স্বপ্নকে ভেঙে দেয়। আর আমরা যদি দায়িত্বশীল না হই, তাহলে আর কেউ আমাদের জন্য সেটা হবে না।*

# ঝামেলা ৩.০

প্রথম এবং দ্বিতীয় ঝামেলার পর এবার তৃতীয় ঝামেলার পালা, চলুন শুরু করা যাক। কিন্তু তার আগে কিছু পূর্বকথা

# কমিটি নির্ধারণ

# টাকা কারা তুলবে?

আমাদের প্রোগ্রাম এর টাকা কার তুলবে এবং কার হাতে থাকবে এটি নিয়ে আমাদেরকে কয়েকবার দ্বিধা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ধাপে ধাপে আমাদের এটি নির্ধারণ এবং পুনঃ:নির্ধারণ করতে হয়। প্রথমে আমরা ভাবছিলাম টাকা কয়জন তুলবে এবং কার কাছে থাকবে। আমরা প্রথমে দিধায় ছিলাম যে টাকা কি একজন তুলবে না প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একজন একজন করে ৩ জন?

আমরা ভেবে দেখলাম কলেজে মোট ১৩০০ এর চেয়েও বেশি শিক্ষার্থী। যদিও এর মধ্যে রেজিস্ট্রেশন করবে আমরা ধারনা করেছিলাম সর্বোচ্চ ৪০০-৫০০ জন কি তারও কম আর একজনের একার পক্ষে এতজনের টাকা তুলা প্রায় অসম্ভব। এবং সেই একজন যদি বিজ্ঞান বিভাগের হয় তবে বাকি সবাই বলে উঠবে যে তাদের বিভাগকে কম প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে যা আমাদের জন্যে খারাপ হবে। তাই প্রত্যেক বিভাগ থেকেই দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। তারপর সিদ্ধান্ত হলো প্রত্যেক বিভাগ থেকে দুইজন টাকা তুলবে, একজন ছেলে ও একজন মেয়ে। অর্থাৎ মোট ৬ জন হবে। তারই ধারাবাহিকতায় সর্বপ্রথম আমরা নির্ধারণ করি আমি (ওয়াসি) আর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ছেলেদের ও মেয়েদের টাকা তুলবে। এবং আর্টস এর মেয়ে হবে হাফসা।

# শুরু হলো প্রকৃত আয়োজন

# ওয়েবসাইট তৈরি

মজার ব্যপার হলো ওয়েবসাইট আমি বানিয়েছি Google Gemini তথা এআই দিয়ে, নিজে না। এখানে আমার কর্তৃত মোটামোটি কম তবে যেকেও চাইলেই আসলে এমন ওয়েবসাইট বানিয়ে ডোমেইন কিনে হোস্ট করতে পারবেনা যদি না তার পুর্ব অভিজ্ঞতা থাকে অথবা যথেষ্ট দক্ষতা থাকে যেইটা আমার আছে। জেমিনি কে দেওয়া আমার প্রম্পটটি ছিলো নিম্নরূপ:

*make a sample website for a college's rag day. the website should be in bengali. it should include space for a logo, consistent colors (which we haven't decided yet so pick a demo). a few photos of the campus and classrooms arranged somehow like maybe a scrolling page or gallery or something like that. about the college. about the program. event schedule (use demo). website should be mobile friendly. and mobile should be a priority. here's some sample information to get started*

আর এর নীচেই দিয়েছিলাম আমাদের কলেজের বেপারে কিছু বিস্তারিত তথ্য যা আমি ChatGPT এর Deep Research মাধ্যমে বের করেছিলাম। তারপর আবার কিছু সংশোধনি করা লেগেছিল কয়েক ধাপে। মূল ওয়েবসাইট এর খসড়া এআই দিয়ে বানালেও পরবর্তীতে সকল কাজ আমার নিজ হাতে করা। এআই একটি সাহায্যকারী বস্ত হলেও মূল কাজ কিন্তু আমারই করা। পরিশেষে আমি বানাতে পেরেছিলাম আমার মনমতো একটি সুন্দর ওয়েবসাইট।

ওয়েবসাইট বানানো শেষ, এবার ওয়েবসাইটটি সবার কাছে উন্মুক্ত করার পালা। প্রথমে আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ডোমেইন কোথা থেকে কিনব। একটু গবেষণার পরে জানতে পারলাম

যে Cloudflare থেকে সবচেয়ে কম দামে ডোমেইন কেনা সম্ভব। এটি বিদেশি হলেও এদের কাছ থেকে বাংলাদেশী কোম্পানির চেয়ে ভালো পরিমাণে সল্পমূল্যে পাওয়া যায়। তবে পেমেন্ট টা করা লাগে কার্ডের মাধ্যমে, আর যেহেতু আমার আম্মুর ব্যাংক এর কার্ড রয়েছে তো আমি এদেরকেই বাছলাম।

ডোমেইন এর আবার মেয়াদ হয়, যত বছর মেয়াদ তত বছরের জন্য আমি ডোমেইনটি ব্যবহার করতে পারব। আমি ভেবে দেখলাম আমার তো মাত্র ৩ মাসের জন্য ওয়েবসাইট টি প্রয়োজন কিন্তু ডোমেইন কেনা যায় সর্বনিম্ন ১ বছরের জন্য। তো বাকি সময় কি করব? সেজানের সাথে পরামর্শ করে বের করলাম যে নিয়েই ফেলি, বাকি সময় নাহয় প্রোগ্রাম এর ছবি ভিডিও স্মৃতির জন্য রেখে দিলাম সাইট টা।

এবার আসি হোস্টিং এর কথায়। আমি শুরু থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম সাইট টি আমি ফ্রি টি হোস্ট করব, এবং এর জন্য আমি আমার সুপরিচিত GitHub Pages ব্যবহার করলাম। এবং অল্পকিছুক্ষণের মধ্যেই https://chayannito26.com কাজ করা শুরু করল। প্রথমেই ওয়েবসাইটার বিষয়টা কাউকে ইচ্ছা করেই জানাইনাই এবং সেজানকেও মানা করে দিয়েছিলাম কাওকে জানাতে। কারণ আরও কিছু কাজ বাকি ছিলো।

তারপর ধীরে ধীরে আরও কিছু কাজ করতে থাকি ওয়েবসাইট এর। প্রতিদিন নতুন কিছু বুদ্ধি আসতো আমার বা সেজনের মাথায় আর আমি সেইটা বাস্তবায়ন করতাম ওয়েবসাইট এর মধ্যে। এভাবে যেতে যেতে আমরা কয়দিন পরেই সবার কাছে ওয়েবসাইট টা উন্মোচন করি। ওয়েবসাইটটির জন্য পরবর্তীতে আমি প্রচুর প্রসংশা পাই বিশেষ করে আমাদের জিলা স্কুলের ২২ ব্যাচেরই এক বড়ভাই জামিউল হাসান সোহানের মুখে যে ৫ অক্টোবর তার ফেসবুকে টাইমলাইনে একটি পোস্ট করে যার লেখা ছিলো:

*পাবনায় গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটা স্কুল ও কলেজ আমাদের সঙ্গে তাদের র‍্যাগ ডে আয়োজন নিয়ে আলোচনা করেছে। এই সময়ের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুষ্ঠান করার প্রবল আগ্রহ থাকলেও, সেই আগ্রহের সঙ্গে সমান তালে স্মার্টনেস, সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পরিশীলন দেখা যায় না। তবে, এর ব্যতিক্রমও কম নয়। মাঝেমধ্যেই এমন কিছু ব্যাচের সঙ্গে কাজের সুযোগ হয়, যাদের রুচি, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই প্রশংসনীয়।*

*আমরা লক্ষ্য করেছি, অনেক সময় শিক্ষার্থীরা র‍্যাগ ডে আয়োজন নিয়ে আলোচনা করতে এলে, তাদের মূল ফোকাস থাকে শুধু স্পন্সরশিপ আর টাকা ঘিরে। অথচ আমরা সবসময়ই বলি, "তোমরা যদি তোমাদের পরিকল্পনায় স্মার্টনেস, চিন্তাশক্তি আর ক্রিয়েটিভিটি দেখাতে পারো, তাহলে টাকা কোনো বিষয় না। টাকা আসুক বা না আসুক, অনুষ্ঠান হবেই - কিন্তু পরিকল্পনা হতে হবে সাহসী ও গুছানো।".*

*এই বছরের ব্যাচগুলোর মধ্যে অন্যতম ছায়ান্বিত '২৬ । শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজ। এই ব্যাচের Faisal এবং Wasi তাদের নাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে স্পন্সরশিপ লেটার পর্যন্ত নানা ধাপে আমাদের পরামর্শ নিয়েছে। শুরু থেকেই তারা অত্যন্ত পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে। বিশেষ করে, পাবনার র‍্যাগ কালচারে তারা প্রথমবারের মতো ব্যাচের একটি ওয়েবসাইট যুক্ত করেছে, যা সত্যিই অসাধারণ উদ্যোগ। এটা তারা নিজেরাই চিন্তা করে বের করেছে, কারো পরামর্শে নয়। এই ওয়েবসাইটে তারা শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে আর্থিক হিসাব প্রকাশসহ নানান কার্যকর ফিচার সংযুক্ত করেছে। নিঃসন্দেহে, এমন সৃজনশীল ভাবনা ও বাস্তবায়ন ছায়ান্বিত '২৬ ব্যাচের পরিপক্কতা ও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ বহন করে।*

*এখন দেখা যাক, তাদের এই সৃজনশীলতা, পরিশ্রম আর দৃষ্টিভঙ্গি তাদের কতদূর নিয়ে যায়। আমাদের প্রত্যাশা, ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে এই শহরের প্রতিটি নতুন ব্যাচ তাদের*

*অগ্রজদের ইতিবাচক ধারাবাহিকতা রক্ষা করবে, যেমনটা তারা করে আসছে নাম, লোগো বা গানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও।*

# মার্চেন্ডাইজ শপ

আমাদের ওয়েবসাইট এর একটি আরও বড় এবং অভিনব সৃষ্টি ছিলো মার্চেন্ডাইজ শপ। উক্ত মার্চেন্ডাইজ শপ এর বুদ্ধি যে কার ছিলো তা ঠিক আমার মনে নেই তবে সেজান বলে বুদ্ধিত বলে আমারই ছিলো তো হয়তো তাই। মার্চেন্ডাইজ মনে হলো আমাদের ব্যাচের লোগোসমৃদ্ধ কোনও বস্ত যা আমরা বিক্রি করব। শুধু কোনো পণ্য কেনাই নয়- বরং এটি একটি ব্যাচের প্রতি নিজের অনুভূতির অভিপ্রকাশ। আমাদের মার্চেন্ডাইজের ধারণাটা ছিলো ঠিক সেখান থেকেই। বিদায় অনুষ্ঠান মানে তো কেবল একদিনের আয়োজন নয়; এটা একগুচ্ছ স্মৃতি, একদল মানুষের গল্প, আর এক অনন্য সময়ের প্রতীক। আমরা চেয়েছিলাম সেই স্মৃতিগুলোকে এমনভাবে ধরে রাখতে, যেন অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলেও তার ছোঁয়া থাকে প্রতিদিনের জীবনে।

তাই আমাদের মাথায় আসে চলো কিছু বানানো যাক যা সবাই নিজের করে রাখতে পারে? টি-শার্ট, হুডি, মগ, ক্যাপ, পানির পট, ফোন কভার- সবকিছুতেই থাকুক "ছায়ান্বিত ২৬"-এর নাম, লোগো, আর সেই আবেগ।

প্রথমে বিষয়টা নিছক রসিকতা হিসেবেই শুরু হয়েছিলো। অনেকেই বলেছিল, "বানায়ে লাভ নাই কেউ কিনবেনা। তারপর একদিন জেদ করে সত্যি সত্যি আমি বসে গেলাম ডিজাইন নিয়ে।

ডিজাইন করা, প্রিন্টিং সার্ভিস খোঁজা, দাম মেলানো—সবকিছুই এক নতুন অভিজ্ঞতা আমার জন্যে। “এই জিনিসটা বানানো সম্ভব?”, “এইটা কি লোকে কিনবে?”, “ফ্যাব্রিকটা কেমন হবে?”- এই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমি মাথায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা করেছি।

ওয়েবসাইটে মার্চেন্ডাইজ সেকশনটা বানানোও ছিলো এক মাইলফলক। কোড, ডিজাইন, ছবি তোলা, পণ্যের বিবরণ লেখা—সবকিছু নিজের হাতে করতে গিয়ে আমি বুঝেছিলাম, একটা ছোট্ট অনলাইন শপ বানানোও কতটা কঠিন কিন্তু তৃপ্তিদায়ক কাজ। অর্ডার ফর্ম, ইনভেন্টরি আপডেট, ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট—সব ছিলো একেবারে পেশাদার প্রজেক্টের মতো। যা আমার জন্যে সত্যি গর্বের একটা ব্যাপার যে আমিও পারি একজন প্রফেশনাল ওয়েব ডেভেলপার এর মতোই সবকিছু করতে।

মার্চেন্ডাইজের আরেকটি বিশেষ দিক ছিলো, এটি আমাদের সবার অংশগ্রহণকে এক জায়গায় বেঁধে ফেলেছিলো। আমি ডিজাইন করছি, যে বন্ধু কাপড়ের সন্ধান দিয়েছে, যে ওয়েবসাইটের ছবির মডেল হয়েছে- সবাই যেনো একটু একটু করে নিজের ছাপ রেখেছে এতে। কারও হাতে ব্যাগ, কারও হাতে মগ, কারও ব্যাগে স্টিকার—এই ছোট ছোট জিনিসগুলোই হয়ে উঠেছিলো আমাদের একতার প্রতীক।

সবচেয়ে তৃপ্তির মুহূর্ত ছিলো, যখন প্রথম প্রথম অর্ডারের ইচ্ছা প্রকাশ করলো সবাই। কেউ একজন, হয়তো কোনো সহপাঠী, চেয়েছে যে সে ছায়ান্বিত ’২৬ এর মার্চেন্ডাইজ কিনবে। সেই সময় আমার শুধু তাদের কথাগুলিই মনে পড়লো যারা বলেছিলো কেও কিনবেনা বানায়ে লাভ নাই।

তখনই মনে হয়েছিলো- আমরা শুধু একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করছি না, আমরা তৈরি করছি একটা ব্র্যান্ড, একটা উত্তরাধিকার। যে আমরাও ছায়ান্বিত '২৬ ব্যাচের অংশ। সবাই যাতে গর্ব করে বলতে পারে তাদের একটা আত্মপরিচয় আছে যে তারাও করে দেখিয়ে দিয়েছে যা পুরা পাবনা শহরে আর কেও পারেনাই।

# সিনেমাটোগ্রাফার নির্ধারণ

# কুপন বই তৈরি

আমাদের কুপন বই দেখলে যেকেও বলতে বাধ্য যে এর আগে পাবনায় এমন কেউ করেনাই। কেননা আমাদের কুপনে বেশ কিছু বস্তু আমরা বিগত বছরগুলোর চেয়ে আলাদা করতে পেরেছি। আমাদের এই কুপন বই এর ডিজাইন করা হয়েছে প্রিন্ট হাউজ থেকেই রানা ভাইকে দিয়ে। আমড়া সকলেই এইটা বলি এবং মানি যে রান ভাইয়ের হাতে জাদু আছে। কেননা সে খুব সহজেই অত্যন্ত সৃজনশীল একটি ডিজাইন বানিয়ে ফেলতে পারেন। ঠিক তারই উদাহরণ আমরা দেখতে পেয়েছিলাম আমাদের কুপন বই তে।

আমরা প্রথমে আমাদের বইয়ে

# কিউআর কোড সিস্টেম

বইটির কিউআর কোড সিস্টেম টি একটি অভিনব সৃষ্ঠি যার বুদ্ধি প্রথমে আমাকে দিয়েছিল সেজান, এটি আমরা এর আগে পাবনা জেলা স্কুলের ২০২২ সালে আয়োজিত ইফতার মাহফিলে দেখতে পাই। তবে সেখানে তার tickify ব্যবহার করেছিল কিন্তু আমি নিজেই তাদের সিস্টেম তৈরি করে ফেলেছি।

সেজান আমাকে বহু আগে থেকেই এই বিষয়ে বলছিল তবে বহুদিন আমি এই বিষয়ে মাথা ঘামাইছিলাম না। হঠাৎ একদিন কেন জানি আমার খুব ইচ্ছা জাগলো দেখার যে আসলেই কি করা যায় কিছু। তো অনেকক্ষণ ভেবে প্ল্যান করে বানিয়ে ফেললাম কিউ আর কোড ভেরিফিকেশন সিস্টেম। উক্ত সিস্টেমের জন্য প্রচুর চিন্তাভাবনা এবং খাটনি করা লাগছে আমার কিন্ত দিনশেষে সব কষ্ট সার্থক কারণ আমি এটি নিয়ে খুবই গর্বিত

প্রত্যেকটি কুপনেই রয়েছে একটি ইউনিক কিউআর কোড যা স্ক্যান করলে রেজিস্টারকারীর সকল তথ্য চলে আসে। এটি সম্ভব হয় কারণ আমি প্রত্যেক রেজিস্ট্রেশনের তথ্য ওয়েবসাইটে দিয়ে রেখেছি এবং সে অনুযায়ী সবকিছুর বেবস্থা করে রেখেছি।

প্রত্যেক কুপনের জন্য একটা রেজিস্ট্রেশন নম্বর আছে যেমন SC-B-0001 হলো আমার, এমন প্রত্যেক নম্বর এর জন্যে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো লিঙ্ক আছে। সেই লিংকে ঢুকলে সেই রেজিস্ট্রেশনকারীর সকল তথ্য দেখা যাবে। এবং প্রত্যেক কুপনে তার রেজিস্ট্রেশন নম্বরের পাশাপাশি সেই নম্বরের লিঙ্ক সম্বলিত একটি কিউ আর কোড আছে।

# রেফারেল সিস্টেম

# ব্যানার তৈরি

# রিল বানানো

# বাজেট নির্ধারন

# ব্যানার কই?

# থিম সং

# AvoidRafa এর আদ্যপান্ত

# এমারজেন্সি কুপন বই!

# “জনাব তানভীর”

তানভীর আহমেদ চৌধুরী। নামটা শুনলেই একধরনের মিশ্র অনুভূতি হয়- রাগ, অবিশ্বাস, আর একটুখানি হতাশা। শুরুতে সে ছিল ঠিকঠাক, কাজ করত, কথা বলত আত্মবিশ্বাস নিয়ে, এমনকি মনে হয়েছিল, হয়তো এই ছেলেটা সত্যিই কিছু করে দেখাতে পারবে। কিন্তু সময়ই শেষমেশ প্রমাণ করল, সে কেবল কথার মানুষ, কাজের নয়।

ঘটনার শুরুটা হয় যখন আব্দুস সিয়ামকে কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হলো। সিয়ামের দায়িত্ব ছিল কমার্স বিভাগের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি সংগ্রহ করা। তার চলে যাওয়ার পর সেই কাজটা এসে পড়ে তানভীরের কাঁধে। তখনও কেউ জানত না, এই সিদ্ধান্ত ভবিষ্যতে কী পরিমাণ ঝামেলার জন্ম দেবে।

প্রথম কয়েকদিন তানভীর নিজেকে এমনভাবে উপস্থাপন করল, যেন এই দায়িত্ব তার জন্মগত অধিকার। সে বলত, “আমি প্রতিদিন কমার্সের ছেলেদের ফোন দিচ্ছি, সবাইকে রেজিস্ট্রেশন করতে বলছি।” কিন্তু দিন গড়িয়ে গেলেও কেউ সেই কথার প্রমাণ দেখতে পেল না। যত কথা, তত ফাঁকা আওয়াজ।

আসলে তানভীরের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল- তার মাদকাসক্তি। সবাই জানত, সে নিয়মিত নেশা করে। রাতভর নেশা বা মদ্যপান করে সকালে অচেতন হয়ে পড়ে থাকে। ফলাফল? ফোনে পাওয়া যায় না, দায়িত্বের খবর নেয় না, কমিটির সঙ্গে

যোগাযোগও রাখে না। এমনকি অনেক সময় এমনও শুনেছি আমরা, যে সে নাকি শিক্ষার্থীদের নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে রেজিস্ট্রেশনের করতে বলছে। এই আচরণই যথেষ্ট ছিল তাকে বাদ দেওয়ার জন্য, তবু তখনও আমরা ভেবেছিলাম- একবার সুযোগ দেওয়া যাক।

কিন্তু ১০ই অক্টোবরের রাতে যা ঘটল, সেটার পর ক্ষমা করার কোনো অবকাশই রইল না।

কমিটির সদস্যদের জন্য রেজিস্ট্রেশনের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল- সেই দিনের মধ্যে সবাইকে রেজিস্টার করতে হবে। প্রায় সবাই করে ফেলল, বাদ রইল তিনজন, তাদের মধ্যে একজন ছিল তানভীর। কিন্তু এই দেরি করার বিষয়টা আসল সমস্যার অল্প অংশমাত্র।

আসল বিপত্তি ঘটল যখন জানা গেল- ৮ই অক্টোবর তানভীর "রিহাদ" নামে একজনের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশনের টাকা নিয়েছে, কিন্তু কাউকে জানায়নি, এমনকি সেই টাকা দেয়ওনি। দুইদিন কেটে গেলেও টাকার হদিস পাওয়া গেল না। বিষয়টা জানার পর আমরা চুপ করে থাকতে পারিনি।

১০ই অক্টোবর রাতে, বিষয়টা নিয়ে চাপ দিলে তানভীর জানাল, "আমি কাল সকালে টাকা দেব, আমি তো দুইদিন ঘর থেকেই বের হইনি।" কথাটা যে মিথ্যা, সেটা তখনই বোঝা যাচ্ছিল। তাই সিদ্ধান্ত হলো, সেজান আর মিনহাজ তার বাড়ি গিয়ে

সরাসরি টাকা নিয়ে আসবে। সময় ছিল সন্ধ্যা ৭টা ৩৬ মিনিট। তানভীর রাজি হলো, বলল, “ঠিক আছে, থাকছি, চলে এসো।”

বারো মিনিট পর, অর্থাৎ ৭টা ৪৮ মিনিটে, সেজান আর মিনহাজ তানভীরের বাসার সামনে পৌঁছে গেল। কিন্তু- বাড়িতে তানভীর নেই। ফোন ধরছে না, মেসেজ দেখছে না। তারা ডাকল, “তানভীইইর!” ভেতর থেকে ভেসে এলো এক ক্লান্ত কণ্ঠ, “কে?”

সেজান বলল, “আমি সেজান।” অভ্যন্তর থেকে উত্তর এল, “তানভীর তো বাসায় নেই।” কণ্ঠটা ছিল তার বাবার।

সেজান বলল, “আঙ্কেল, আপনাকেই দরকার।” কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন তানভীরের বাবা- চোখে একটু বিভ্রান্তি। সেজান জিজ্ঞেস করল, “তানভীর কোথায়?”
বাবা বললেন, “এইতো কিছুক্ষণ আগে বের হলো, কোথায় গেছে জানি না।”
সেজান বলল “কখন ফিরবে?” তানভীরের বাবা উত্তর দিলেন “জানি না”

সেজান পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন- তানভীরের কাছে কিছু রেজিস্ট্রেশনের টাকা আছে, কুপন আছে, তাই তারা নিতে এসেছে। বাবা বললেন, “সকালে আসো।”

এরপর সেজান আমাদের গ্রুপে পুরো ঘটনাটা জানাল সেখানে একটু কথা হলো। রাত ১০টা ৭ মিনিটে হঠাৎ তানভীর আমার ইনবক্সে লিখল- “Check।” চেক করে দেখি, সে সত্যি বিকাশে ১১৯৫ টাকা পাঠিয়েছে। কিন্তু এখানেও সমস্যা-

প্রথমত, ৫ টাকা কম, দ্বিতীয়ত, সে বলল এই টাকা নাকি তার নিজের রেজিস্ট্রেশনের জন্য। অথচ আমরা সবাই জানি, সেটা "রিহাদ"-এর টাকা।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "বাকি টাকা কোথায়?"
সে বলল, "হাতে নগদ টাকা আছে। সকালে দেব"
আমি বললাম, "এখনই পাঠাও।"
সে উত্তর দিল, "Shezan ek taratari asper koisilam" এবং "Liye gele amar r pera leua lagto nh।" অর্থাৎ, সে দাবি করছে, সে নাকি সেজানকে তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিল! ভাবা যায়? মাত্র দশ-বারো মিনিটের ব্যবধান, এর মধ্যেই সে বেরিয়ে গেছে! যে দুইদিন ঘর থেকে বের হয়নি, কিন্তু ঠিক যেই সময় আমরা যাচ্ছি, সেই সময়ই সে হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছে? কোনো খবরও দেয়নি, অপেক্ষাও করেনি? সবই তার ধোঁকা।

আমি আমার ইনবক্সের ঘটনাটা সেজানকে জানালাম, সে তানভীরের সঙ্গে ক্যাশ গ্রুপে কথা বলল। সেজান বলল, "আমরা দেরি করিনি, মাত্র ১২ মিনিটে পৌঁছেছি।"
তানভীরের উত্তর- "E vai amar ekjaygay pora silo।"
একটা এমন হাস্যকর অজুহাত যে শুনে হাসব না কাঁদব বোঝা যাচ্ছিল না। শুক্রবার রাতে রাত আটটার পর কোনো শিক্ষক, কোচিং বা ক্লাস খোলা থাকে- এমনটা কল্পনাই করা যায় না।

শেষে সেজান জানাল, “তোমার দায়িত্ব এখন জায়িদের হাতে। রেজিস্ট্রেশন বইটাও তাকে দিয়ে দাও। এবং রেজিস্ট্রেশনের টাকা টা দেও”
তানভীর বলল, “আমার হাতে নগদ টাকা আছে, বিকাশে নয়। সকালে দেব”
তখন সেজান মিনহাজকে বলল, “তুমি গিয়ে নিয়ে আসো।”
তানভীর রেগে গিয়ে বলল, “চুপ কর তো!” এবং “তোর কি মাথা খারাপ নাকি!”

সেজান শান্তভাবে বলল, “মিনহাজের কোনো সমস্যা নেই যেতে। আঙ্কেল কিছু বললে আমরা বুঝিয়ে নেব।”
তানভীর তখন বলল, “সকালে এসো, বাবা রেগে যাবে।”
সেজান বলল, “তাহলে জানালা দিয়ে টাকা আর বইটা দাও।”
তানভীরের উত্তর- “Het vudar beta janala nai eto pera dis kah ghum theke uthe wasir bkash e tk geley hoilo।”

মানে সে দাবি করছে, তার বাড়িতে নাকি জানালা নেই! এমন এক অদ্ভুত যুক্তি দিল যে মনে হয় সে আয়নাঘরে থাকে। এরপর সে চুপ করে গেল। আর কোনো উত্তর নেই, কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই ঘটনা গ্রুপে আলোচিত হলো। সবাই বলল, “তানভীরকে সরিয়ে দাও।” সিদ্ধান্তও নেওয়া হলো- তানভীরের দায়িত্ব জায়িদের হাতে দেওয়া হবে, আর যে টাকা সে পাঠিয়েছে, সেটা “রিহাদ”-এর নামেই গণ্য হবে, তার নিজের নয়।

সবাই একরকম হাসাহাসি করল, বিদ্রূপ করল, কারণ তানভীর তার নিজের আচরণেই নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছিল।

শেষে তানভীর সেজানকে মেসেজ করল, "আগামীকাল সকাল ১১টায় কলেজের সামনে দেখা করো, একান্তে কথা বলব।"

এরপর আর কিছুই রইল না- ঘৃণা, হতাশা আর এক নিঃশব্দ সিদ্ধান্ত ছাড়া।

তানভীরের গল্প এখানেই শেষ নয়, কিন্তু এখানেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা শেষ হয়ে যায়। যে মানুষ দায়িত্বের জায়গায় দাঁড়িয়ে বারবার মিথ্যা বলে, দায়িত্বে গাফিলতি করে, এমনকি অন্যের টাকাও গোপন রাখে- তাকে আর "কমিটির সদস্য" বলা যায় না।

তার নাম হয়তো "জনাব তানভীর", কিন্তু আমাদের চোখে সে একদমই জনাব নয়।

# ফেসবুক পোস্ট ডিজাইন ও বুস্টিং

এবারের আয়োজনে আমি আর শেজান মার্কেটিং আর সোশ্যাল মিডিয়ার প্রসারের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়েছিলাম। আমাদের লক্ষ্য ছিল, আমাদের ডিজিটাল উপস্থিতিটা যেন আগের সব আয়োজনকে ছাপিয়ে যায়। পোস্টার ডিজাইনের জন্য আমার মাথায় একটা চিন্তা এলো। প্রথমে ভেবেছিলাম, যেখান থেকে ব্যানার ডিজাইন করিয়েছি, সেই প্রিন্ট হাউস থেকেই পোস্টারগুলো তৈরি করব। তাদের সাথে কথাও বলেছিলাম, কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, তাদের মূল দক্ষতা ছাপার কাজে, ডিজাইনে নয়। তাছাড়া, তাদের সাথে অনলাইনে কাজ করাটাও একটা ঝামেলার ব্যাপার ছিল। তাদের দিয়ে কাজ করতে হলে সামনাসামনি বার বার তাদের পাশে বসে থেকে চামচ দিয়ে গেলানোর মতো করে সবটা বুঝিয়ে দিতে হতো, যা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই সেই চিন্তা বাদ দিলাম।

এই সময়েই আমার মাথায় আসে আমার বন্ধু নূরের কথা। নূর ঢাকার ছেলে, বয়স আমার সমান, ও একটা এজেন্সিতে পোস্টার ডিজাইনের কাজ করে। তার বেশ চাহিদা, কিন্তু তার কাজের মান এতটাই উঁচু যে তার উচ্চ পারিশ্রমিক আমার কাছে কিছুই মনে হয়নি। নূরের সাথে আমার পরিচয়টাও আবার বেশ অদ্ভুত। ওর প্রাক্তন প্রেমিকা ছিল পাবনার, আর আমার এক কাজিনের সাথে সেই মেয়ের বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্র ধরে আমার ভাইয়ের সাথে নূরের পরিচয় হয়, আর ভাইয়ের মাধ্যমেই আমার সাথে ওর যোগাযোগ। আমি জানতামই না যে নূর এত ভালো ডিজাইনের কাজ করে। একদিন যখন ভাই ওর কাজ দেখাল, আমি এক মুহূর্তেই বুঝে গেলাম, আমার অনুষ্ঠানের জন্য এই ছেলেকেই দরকার।

রেজিস্ট্রেশনের শেষ তারিখ জানানোর জন্য প্রথম পোস্টারটা ওকে বানাতে দিই। ও প্রথমে কোনো টাকা নিতেই রাজি হয়নি। বলেছিল, কাজটা ও কেবল আমার খুশির জন্যই করতে চায়, আর আমার যদি পছন্দ হয়, তাহলেই যেন আমি কিছু দিই। আমি ওকে পোস্টারের জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিয়ে দিলাম। বিকেলে ও যখন কাজ শুরু করল, আমি আর আলভেজ বাইরে খেতে গেলাম। রিকশায় করে রেস্তোরাঁর দিকে যেতে যেতেই নূর আমাকে পোস্টারটা পাঠাল।

পোস্টারটা দেখে আমার মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছিল। আমি যা আশা করেছিলাম, এটা তার চেয়েও হাজার গুণ সুন্দর ছিল। আমি এমন একজন মানুষ, যাকে সহজে মুগ্ধ করা যায় না, কিন্তু নূরের কাজ দেখে আমি পাগল হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিলাম। শুধু আমি নই, সেজালও পোস্টারটা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কমিটির বাকি সবারও আমার মতোই প্রতিক্রিয়া ছিল।

পোস্টটা ফেসবুকে দেওয়ার পর অনেকেই আমাকে মেসেজ দিয়ে জানতে চেয়েছিল, কে এই পোস্টার বানিয়েছে। তারা ওকে দিয়ে কাজ করাতে চেয়েছিল। কিন্তু আমি কাউকেই নূরের তথ্য দিইনি। আমি চেয়েছিলাম, ও শুধু আমার অনুষ্ঠানের জন্যই কাজ করুক। ও যেহেতু আমার বন্ধু, তাই ওর কাজটা আমি আর কারও সাথে ভাগ করতে চাইনি। এরপর থেকে আমাদের অনুষ্ঠানের প্রায় সব পোস্টার, এমনকি কভার ফটোটাও নূরই তৈরি করেছিল।

ফেসবুক পেজ বুস্টিংয়ের ক্ষেত্রে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের পেজের কোনো ভিডিওই সেভাবে বুস্ট করতে হয়নি। অবাক করার মতো ব্যাপার হলো, কোনো রকম

বুস্টিং ছাড়াই আমাদের ভিডিওগুলো ৬০-৭০ হাজার ভিউ ছাড়িয়ে যেত। আমরা ঠিক জানি না এর কারণ কী। হতে পারে আমাদের কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের নেটওয়ার্ক অনেক শক্তিশালী, অথবা আমাদের কলেজের সামাজিক উপস্থিতিটাই এমন। কিন্তু সত্যিটা হলো, ভিডিও বুস্ট করার জন্য আমাদের কোনো টাকা খরচ করতে হয়নি। এটা আমাদের জন্য একটা গর্বের বিষয় ছিল, আর আমরা এতে অনেক খুশিও ছিলাম। গত বছরের ব্যাচকে রিচের জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছিল, কিন্তু আমাদের সেই টাকাটা বেঁচে গিয়েছিল। তাই আমি সেই টাকাটা পোস্টার ডিজাইনের দিকে খরচ করতে পেরেছিলাম, কারণ গত বছর তাদের পোস্টারের মান আমাদের মতো ছিল না।

# টাকা নিয়ে সংশয় ও দুশ্চিন্তা

যেকোনো বড় স্বপ্নের পেছনেই লুকিয়ে থাকে এক বিশাল পরিমাণ অনিশ্চয়তা, আর আমাদের "ছায়ান্বিত '২৬"-এর স্বপ্নযাত্রার সবচেয়ে বড় পাহাড়টা ছিল আর্থিক। যখন আমরা প্রথম আমাদের বিদায় অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা সাজাতে বসলাম, তখন বাজেটের খসড়া অঙ্কটা দেখে আমাদের বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল- আট লক্ষ টাকা! এই বিপুল পরিমাণ অর্থ কোথা থেকে আসবে, কীভাবে জোগাড় হবে এই প্রশ্নগুলো প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়া করে ফিরছিল।

আমি আর সেজান কত শতবার যে এই বিষয়টা নিয়ে বসেছি, তার কোনো হিসাব নেই। রাতের পর রাত আমাদের আলোচনা চলত, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট পথ খুঁজে পেতাম না। প্রতিটি আলোচনার শেষে আমরা যেন এক অথৈ সাগরে দিশেহারা নাবিকের মতো অনুভব করতাম। এটা তো সত্যি যে, শুধু শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে এত বড় একটা আয়োজন সম্পন্ন করা প্রায় অসম্ভব। আমাদের নির্ভর করতেই হতো স্পনসরদের ওপর। কিন্তু এই স্পনসরশিপ ব্যাপারটাই ছিল সবচেয়ে বড় অনিশ্চয়তার নাম। আমাদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছিল ব্যতিক্রম ২২ এর মতো স্কয়ারের অথবা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম, কিন্তু সেটা ছিল অনেকটা মরিচীকার মতো দূরেই সুন্দর, কাছে গেলেই মিলিয়ে যাওয়ার ভয়।

আমার নিজেরই প্রাণপ্রিয় স্কুল পাবনা জিলা স্কুলের বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল। আমি দেখেছিলাম, কীভাবে বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেওয়া মানুষগুলো শেষ মুহূর্তে পিছু হটে যায়। তাদের মুখের কথাগুলো ছিল কেবলই ফাঁকা আওয়াজ, যা আমাদের

বিশ্বাসকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। সেই স্মৃতিটা আমার মনে এতটাই গেঁথে ছিল যে, এবার কোনো ফাঁপা আশ্বাসের ওপর ভরসা করতে আমি রাজি ছিলাম না। কারণ আমরা একবার সেই ভুল করে এসেছি। আমরা বুঝতে পারছিলাম, ভাগ্যের ওপর সবটা ছেড়ে দিলে চলবে না; আমাদের নিজেদেরই শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। এবার আর একই ভুল করা যাবেনা।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমরা আমাদের পরিকল্পনায় সবচেয়ে বড় পরিবর্তনটা আনলাম। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম, বাজেট কমাতে হবে। অপ্রয়োজনীয় প্রতিটি খরচ ছেঁটে ফেলে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সবচেয়ে সাশ্রয়ী কিন্তু মানসম্মত পথটা খুঁজে বের করার জন্য আমরা দিনরাত এক করে ফেললাম। এটা ছিল এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। আমাদের লক্ষ্য ছিল একটাই, অনুষ্ঠানের মানের সাথে কোনো আপস না করে বাজেটটাকে একটা বাস্তবসম্মত জায়গায় নামিয়ে আনা। কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা সফলও হলাম। আট লক্ষ টাকার পাহাড়টাকে আমরা সাত লক্ষের নিচে নামিয়ে আনতে পারলাম, যা ছিল আমাদের প্রথম বড় জয়।

একটা সুনির্দিষ্ট বাজেট হাতে আসার পর আমাদের লক্ষ্যটা আরও স্পষ্ট হয়ে গেল। আমরা এখন জানি, আমাদের ঠিক কত টাকা প্রয়োজন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করলাম। আমাদের প্রথম রেজিস্ট্রেশন পর্ব শেষ হওয়ার পর যখন হিসাব কষলাম, তখন দেখলাম প্রায় ১০০ জন রেজিস্টার করেছে এবং আমাদের হাতে এসেছে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। এই টাকাটা আমাদের মনে নতুন করে সাহস জোগাল। এরপর সমস্ত হিসাবনিকাশ করে আমরা দেখলাম, অনুষ্ঠানটা সফলভাবে শেষ করতে আমাদের আর মাত্র দুই লক্ষ সত্তর বা আশি হাজার টাকার মতো প্রয়োজন।

সেই মুহূর্তে আমাদের বুক থেকে যেন একটা বিশাল পাথর নেমে গেল। আমরা বুঝতে পারলাম, বাকি টাকাটা আমরা অন্য স্পনসর এবং আরও কিছু শিক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন থেকে তুলে ফেলতে পারব। অনিশ্চয়তার কালো মেঘ কেটে গিয়ে আমরা প্রথমবারের মতো এক ঝলক স্বস্তির আলো দেখতে পেলাম। আমরা তখন পুরোপুরি নিরাপদ না হলেও, আগের চেয়ে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। আমাদের মনে হচ্ছিল, হ্যাঁ, এই স্বপ্নটা এবার সত্যি করা সম্ভব।

# স্পন্সর লিস্ট তৈরি ও স্পন্সর লেটার পাঠানো

# স্কয়ার থেকে কল ও সেদিনের মুহূর্ত

দিনটা ছিল রবিবার, ৫ অক্টোবর ২০২৫, ঘুম থেকে উঠে আমরা কেউই ভাবতে পরিনাই আজকে এত বড় কিছু হতে যাবে। সেদিন সকালে সেজান সকালে কল দিল এবং বলল সবাইকে ফোন দিতে হবে তাড়াতাড়ি কলেজে আসো। আমি তার কথামত রওনা দিলাম এবং সাথে করে স্পনসর লেটারগুলো নিয়ে গেলাম যে আমাকে এগুলি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠাতে হবে। তারপর আমি কলেজে গিয়ে দেখি সেজান আরও সবাইকে ডেকেছে কল দেওয়ার জন্য। তো গিয়ে লাইব্রেরিতে বসলাম বসে আমরা কিছুক্ষণ আলোচনা করছি ঠিক তখন সেজানের ফোনে একটি কল আসলো। সে মনে করল যে কলটি সে একটি জিনিস অনলাইনে অর্ডার দিয়েছিল সেইটির জন্য বলে সেইটি কেটে দিল। তখনও অমরা বুঝে উঠতে পরিনাই যে কলটি ছিলো স্কয়ার থেকে! তারপর আমি ওদেরকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বের হয়ে পড়লাম চিঠিগুলো পোস্ট অফিসে দিয়ে আসার জন্য।

পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠিগুলো দিয়ে বের হতে হতে আমার কাছে কল আসলো আমার ভাই আলভেজের। সে আমাকে জানালো যে দারাজ থেকে নাকি কল দিয়েছিল আমার একটা অর্ডার আছে। আমি কিছুক্ষণ ভেবে বুঝলাম যে সেগুলি ছিলো ইনভিটেশন কার্ড বানানোর জন্য অর্ডারকৃত কাগজ। এবং আমার ফোন কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল জন্যে আমার ফলে কল আসছিল না। আমি দারাজের অফিসের উদ্দেশে রওনা হলাম এবং গিয়ে একটু বকা খেয়ে শেষমেশ সফলভাবে কাগজগুলি রিসিভ করলাম। টাকা আগেই বিকাশে দেওয়া ছিলো। তারপর আমি রওনা হলাম আবার কলেজের উদ্যেশে। কলেজে গিয়ে সেজান মেহবুবা মৃত্তিকা তিনজন ৩ তলায় বসে আসে বেঞ্চের ওপর। তার কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি শুরু হলো এবং সেই বৃষ্টি কিছুক্ষণ পরেই ঝড়ে রূপ নিলো। এর মধ্যেই সেজান বের

হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে আমরা তিনজন ও বেরিয়ে পড়লাম ঝড়ের মধ্যেই। ওরা দুজন একটি রিকশা নিয়ে একজন অপরজনকে নামিয়ে বাসায় চলে গেল। আর আমি গেলাম আমার নানুবাড়ি। হঠাৎ কেন জানি আমার বাসায় যাইতে মন চাইলো না মনেহল নানুবাড়ি যাই, তাই গেছিলাম।

নানুবাড়ি গিয়ে বৃষ্টিতে আমার জামা ভিজে গিয়েছিল বলে আমি আমার মামার গেঞ্জি টা পড়ামাত্রই সেজানের ফোন এলো। ফোন দিয়ে সেজান বলল যে "আই লাভ ইউ, কাম হয়ে গেছে!" আমি শুনে বললাম কি হয়েছে? সে উত্তরে বলল "ডিল ডান!" আর বলল যে "স্কয়ার রাজি!" আর আমাকে দ্রুত ফাহিম ভাইয়ের বাসায় আসতে বললো। আমি নানুবাড়ি সব কাজ ফেলে আমার বিশ্রাম বিসর্জন দিয়ে রওনা হলাম ফাহিম বইয়ের বাড়ির উদ্যেশ্যে। তখন ছিলো প্রচণ্ড ঝড়, আমার নানু আর মামা তো কোনোভাবেই আমাকে বের হতে দিবেন এই ঝড়ের মধ্যে। আমি নানুকে বুঝলাম নানু লাখ লাখ টাকা ঝুলে আছে আমাকে এখন যেতেই হবে। নানু আর মামা শেষমেশ রাজি হলো আমাকে যেতে দিতে এবং আমাকে একটা ছাতা ধরিয়ে দিল। ছাতা হাতে আমি রওনা হলাম। আমি তো ভাইয়ের বাসা চিনিনা তো সেজান বললো মুক্তমঞ্চ এ আসতে এবং আসার সময় আমাকে সিগারেট আনতে বললো সেখানে যারা আছে সকলের জন্যে।

রিকশায় উঠেই রিকশাওয়ালা কে বললাম মুক্তমঞ্চ যাব, আর বললাম সিগারেট কিনতে হবে একটা দোকান দেখলে থামায়েন। পরে রিকশায় উঠে ভুলেই গিয়েছিলাম সিগারেটের কথা, হঠাৎ করে রিকশা থামলো একটা দোকানের সামনে, তখন আমার মনে পড়লো যে সিগারেট কিনতে হবে। তখনও ঝড় চলছেই তবে একটু কম। আমি এমন একজন মানুষ যে সিগারেট খাওয়া তো দূরের কথা কোনোদিন সিগারেট হাতে ধরেও দেখিনাই, কিন্ত সেদিন আমি খুশিতে হোক আর যে কারনেই হোক কিনে ফেললাম ১০ টা "ক্যামেল" যা

আমি সহ আমার সকল বন্ধুরা মনে করত আমার দ্বারা করা অসম্ভব একটা ব্যাপার। ক্যামেল কিনে আমি কললাম মুক্তমঞ্চ এর পথে।

মুক্তমঞ্চ এ নেমে মিনহাজ কল দিয়ে বলল কই? আমি বললাম আমি মুক্তমঞ্চ এ। মিনহাজ বলল ওর জন্যে দাঁড়াতে, আমি বললাম যে আমি ফাহিম ভাইয়ের বাসায় যাচ্ছি একবারে ওখানেই আসতে। তারপর আমি সেজনকে একটা কল দিলাম সে আমাকে ঠিকানা আরও বিস্তারিত বলল আর আমি সেই উদ্দেশ্যে চলতে থাকলাম। যেতে যেতে হাতের বামে দেখি বনমালী শিল্পকলা একাডেমিতে ওইদিন কনটেন্ট ক্রিয়েটর গ্রান্ড মিট নামের এক প্রোগ্রাম হচ্ছিল, প্রথম দেখতে বুঝে উঠতে পারিনাই কিসের প্রোগ্রাম। আমি সেটিকে পাত্তা না দিয়ে চলা শুরু করলাম। আমি তখনও সেজনের সাথে কলেই রয়েছি। কিছুদুর যেয়েই বাসা পেলাম আর সেজান বললো ভিতরে গিয়ে গার্ড কে বলতে যে ৭ডি তে যাব। আমি দেখি আমার সামনেই একজন গার্ড আছে এবং তার সাথে একটি মহিলা কথা বলছে। আমি গার্ডটিকে বললাম আর মহিলাটি বলে উঠলো আমার ফ্ল্যাটে যাবে যেতে দেও। মহিলাটি সম্ভবত ফাহিম ভাইয়ের মা ছিলো।

আমি ভেতরে গিয়ে লিফ্ট এ উঠে হাতের ডানে সব তলার বোতামের মধ্যে হতে ৭ম তোলার বোতাম খুঁজে বের করে চাপ দিলাম। তখন লিফটের মধ্যেকার কয়েক সেকেন্ড মনের ভিতর অন্যরকম একটা অনুভূতি কাজ করছিল। বিশ্বাসই করতে পড়ছিলাম না যে আসলেই আমরা এত বড় একটা স্পনসরশিপ হাতে পেয়েছি! তারপর লিফ্ট গিয়ে ঠেকলো ৭ তলায়, বেরিয়েই দেখি একটা আংকেল তার ফ্ল্যাট থেকে বেরোচ্ছে। আঙ্কেল কে বললাম "আঙ্কেল ৭ডি ফ্ল্যাট টা কোন দিকে একটু বলতে পারবেন?" আঙ্কেলটি আমাকে জানালো বাম দিকে যেতে হবে। আমি গেলাম গিয়ে ফোনের ফ্ল্যাশলাইট জ্বলিয়ে খুঁজতে থাকলাম ৭ডি কোথায়। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলাম আমার কাঙ্ক্ষিত ফ্ল্যাটটি। প্রথমে বেল

বাজালাম কিন্তু কোনো সারা শব্দ পেলাম না। আমি তো প্রথমে দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম যে ভুল জায়গায় ই কি চলে আসলাম? পরে সেজানকে মেসেজ দেওয়ার পর সে ভেতর থেকে গেট খুলে দিল এবং আমি একটি সস্তির শ্বাস ফেললাম।

ভেতরে ঢুকেই প্রথমে চলে গেলাম ফাহিম ভাইয়ের রুমে

## সবাইকে কল ও এসএমএস দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে বলা

আমার প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিলো গতবছরের ন্যায় এবারও সবাইকে কল দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে উদ্বুদ্ধ করব আমরা। তো আমার মধ্যকার একট মজার বিষয় হলো আমার কোনোকিছুতে প্রবল ইচ্ছা জাগলে সেই ইচ্ছা পূরণ করার জন্য আমার মধ্যকার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে যাকে সেজান কামুর বলে। তো সেই কামুর মিটানোর জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমি এসএমএস দেওয়ার জন্য অ্যাপ বানাবো। তো যেমন ভাবনা তেমন কাজ। আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে বানিয়ে ফেললাম একসাথে সকলকে এসএমএস দেওয়ার একটি অ্যাপ।

তবে সেই অ্যাপ ব্যবহারের সুযোগ আমার হয় আরও পরে কেননা আমি অ্যাপ বেশিই আগে বানিয়ে ফেলেছিলাম তখনও সবকিছু প্রস্তুত ছিলনা। তো পরবর্তী পদক্ষেপ ছিলো আমার কল দেওয়ার জন্য অ্যাপ বানানো। এই একটা অ্যাপ এর মাধ্যমে চাইলে একসাথে ১০-১৫ জন অথবা আরও বেশিজন মিলে সব শিক্ষার্থীকে কল দিতে পারবে একে একে। যতজনের কাছেই এই অ্যাপ দিছি সবাই অ্যাপ তির প্রচুর প্রশংসা করেছে কেননা এই অ্যাপ এর মধ্যে প্রায় সকল ফিচার এ রয়েছে যা করো প্রয়োজন হতে পারে কল করার জন্য।

ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের এর জন্য নম্বর সংগ্রহ আমি বহু আগেই ভর্তির সময় করে রেখেছিলাম কলেজের ওয়েবসাইট থেকে। তবে এখন আর আগের মতো সেটি করা যায়না। সেখানে মোট ১২৫০ জন শিক্ষার্থীর নম্বর ছিলো।

আপ এ মেইন স্ক্রিন এ কলেজের ডিপার্টমেন্ট দেখা যায় জা ছেলে ও মেয়ে ভেদে সাজানো। কেউ চাইলে যেকোনো ডিপার্টমেন্ট ও ছেলে বা মেয়ে সিলেক্ট করে সেই ডিপার্টমেন্ট এর সকলের নাম দেখতে পারবে একটি স্ক্রিনে। সেখানে ইচ্ছামত একজনকে সিলেক্ট করে কল দেওয়া যাবে এবং কল শেষে আপের মাধ্যমেই কলের ফলাফল ও নোট সংরক্ষণ করা যাবে তার সম্পর্কে। এবং পরবর্তীতে একই স্ক্রিনে ফলাফল অনুসারে ফিল্টার করে চাইলে পুনরায় কল দেওয়া যাবে সবাইকে

এই অ্যাপ বানানোর পর আমরা আস্তে আস্তে সবাইকে কল দেওয়া শুরু করি। মেয়েরা ছিলো বিশেষ করে খুব কাজের। তাদের মাত্র কয়দিনেই সকল মেয়েকে কল দেওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত ছেলেরা ছিলো এইদিক দিয়ে অনেকাংশে পিছিয়ে। তাদের কল দিতে অনেক বেশি সময় লেগেছিল। প্রে টেস্ট পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরেও সবাইকে কল দেওয়া শেষ হয়েছিল না। ফলে আমি একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম

# খাবারের সন্ধানে

বিদায় অনুষ্ঠানের জন্য খাবার কোথা থেকে সংগ্রহ করব এইটা নিয়ে আমরা প্রথমদিকে কিছুটা দ্বিধার মধ্যে ছিলাম। এবং খাবারের পাশাপাশি কি দিব না দিব এগুলো নিয়েও চিন্তা করছিলাম। প্রথমে আমরা গতবছরের খোঁজ নিলাম, তাদের রাজ বিরিয়ানি সম্ভবত ১০৫ টাকা প্যাকেট এ হাফ পোলাও রোস্ট দিয়েছিল। আমরা রাজ বিরিয়ানি তে আগেই না গিয়ে আগে আরও কিছু রেস্টুরেন্ট বিবেচনা করলাম।

তার আগে আমরা ভাবলাম কি কি দেওয়া যায়। পোলাও রোস্ট তো অবশ্যই, সাথে হয়তো সালাড হয়তো ফুল/হাফ ডিম। সাথে পানীয় হিসেবে প্রথমে সেজান ভাবলো জিরা পানি তবে সবার এটি পছন্দ নাও হতে পারে তাই পরে আমরা চাইলাম মোজো দিতে। কিন্ত তারপর আরও কিছু চিন্তাভাবনা করে শেষমেশ আমরা সাধারণ পানি নির্ধারণ করলাম ৫০০ মিলি। সাথে কাস্টমাইজড প্যাকেট তো থাকছেই!

এর জন্য প্রথমে আমরা নিজে বাবুর্চি ভাড়া করার কথা বিবেচনা করি। কিন্ত এখানে সমস্যা হলো বিয়েতে রান্নার জন্যে যারা সেইসব বাবুর্চিরা সবসময় চেষ্টা করে খাবারের মান ভালো রাখতে এবং খাবার সুস্বাদু রাখতে যার ফলে তাদের রান্না তে তারা অতিরিক্ত খরচ করে ফেলে। অন্যদিকে রেস্টুরেন্ট একপ্রকার ব্যবসা এবং ব্যবসা চলেই লাভ দিয়ে ফলে সেইসব বাবুর্চি জানে কিভাবে টাকা বাঁচায়ে কম খরচে রান্না করা যায়।

প্রথমে আমরা কলেজে বসেই কল দিয়েছিলাম কাচ্চি ভাই কে। ভাইয়া না, ভাই। কারণ তারা তাদের নতুন শাখার কাজ করছিল পাবনায় যা ডিসেম্বর নাগাদ হয়ে যাবে। তো আমরা তাদের কর্পোরেট অর্ডারিং এর নম্বরে কল দেই দিয়ে জানতে পারি তাদের একদম

৩০০। যত পিসই নেই দাম একই। তাই তার আগেই বাদ কারণ আমাদের অত বাজেট নেই

তারপর আমরা গেলাম কাশমেরিতে। কাশমেরি তে অফিসরুমে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা করে যা বুঝতে পারলাম তারাও আমাদের বাজেটের বাইরে। তার আমাদের প্রথমে পোলাও রোস্ট ডিম এর জন্যই ১৭০ টাকা পিস হিসাব দেয়। এর সাথে মোজো আমাদের আলাদা কিনতে হবে সাথে প্যাকেটি এরও খরচ আছে যা আমরা সামলাতে পারবোনা। পরে আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পরেও কিছুই আমাদের পছন্দ হলোনা।

তার পর আমরা কাচ্চি ভাইয়া টি গেলাম। আগে ভাই এবার ভাইয়া। সেখানে তার আমাদের ১২৫ টাকা হিসাব দিল ডিম বাদে শুধু পোলাও রোস্ট আর একটু সালাদ অর্থাৎ দুই ফালি শসা। আমরা ভাবছিলাম নিয়েই কি নেই। কিছুদিন এতদূরই ছিলো।

কিন্ত তারপর একদিন ব্যান্ড সম্পর্কে ওহি ভাইয়ের সাথে আলোচনা করার মধ্যে ওহি ভাই আমাদের জানালেন তার নাকি রান্না করার ব্যবস্থা আছে এবং সে চাইলে রান্না করে দিতে পারবে। তো আমরা তার দিকেই অগ্রসর হই।

এবার আসি প্যাকেটের খরচে। হাফ বিরিয়ানির প্যাকেট প্রিন্টিং সহ আমাদের পড়বে ৭ টাকা এবং ৩/৪ অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ সাইজ এর প্যাকেট পড়বে ৮ টাকা

# বিভিন্ন ধাপে কমিটি থেকে ছাটাই